ডারউইন দিবসের বিশেষ রচনা

ডারউইন যে ভাবে বিজ্ঞানী হলেন

-জাহেদ আহমদ

'যখন আমার স্কুলে প্রবেশ করার বয়স হয়ে ওঠে, তখন থেকেই প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ, বিশেষ করে এটাসেটা সংগ্রহ করার প্রবণতা পুরোপুরিভাবে আমার মাঝে দেখা দেয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের নাম জানার চেষ্টা করতাম আমি; সংগ্রহ করতাম হরেকরকমের জিনিস, খোলক, সীলমোহর, ডাকটিকেট, মুদ্রা এবং খনিজ পদার্থ। সংগ্রহ করার এই ঝোঁক যা একজন মানুষকে সুশৃংখল প্রকৃতিবিদ, সুনিপুণ শিল্পীর পর্যায়ে নিয়ে যায়—তা আমার মধ্যে খুব প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। সন্দেহ নেই এটি ছিল আমার মধ্যে জন্মগত কেননা, আমার ভাই-বোনদের বাকী সবার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য ছিল অনুপস্থিত।' সাতষট্রি বছর বয়সে(১৮৭৬) লেখা আত্নজীবনীতে নিজের ছেলেবেলাকে এ ভাবেই চিত্রিত করেছেন ডারউইন।

বালক বয়স থেকেই প্রকৃতি সম্পর্কে বেজায় কৌতুহলী ছিলেন চার্লস্ ডারউইন। বিশাল আকারের পারিবারিক বাগানে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকতেন। চরম আগ্রহ আর পরম বিস্ময়ে অবলোকন করতেন ফুল, পাখি, ছোটবড় উদ্ভিদ আর পোকামাকড়। পিতা রবার্ট ডারউইন একবার বালক চার্লস্কে বিশেষ একটি ফুল গণনা করতে বললে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গণনা শেষ করে তিনি জানিয়েছিলেন, সেখানে রয়েছে সর্বমোট ৩৮৪টি ফুল! চার্লসের শখের মধ্যে আর ও ছিল- পাখি শিকার, গাছে চড়া, নদীর তীরে খেলাধুলা ও মাছ শিকার। তবে সবচেয়ে বড় পছন্দ ছিল বিভিন্ন ধরনের জিনিস সংগ্রহ করা। হরেকরকমের পোকা সংগ্রহ করতে চার্লসের জুড়ি ছিল না। পরিণত বয়সে সে সময়ের তেমনি এক মজার গল্প শুনিয়েছিলেন তিনি। একবার এক জায়গায় বালক চার্লস্ দুটি দূর্লভ প্রজাতির পোকা দেখতে পেলেন। সাথে সাথে দু'হাতের মুঠোয় পুরে নিলেন পোকা দুটিকে। ঠিক তখনই সন্ধান পেলেন তৃতীয় আরেকটি নতুন পোকার। অতি উৎসাহী চার্লস্ কিছুতেই ওই পোকাটিকে ও হাতছাড়া করতে চাইলেন না। কি আর করা! তিনি ডান হাতের পোকাটিকে মুখে পুরে নিয়ে সেই হাতে তৃতীয় পোকাটি ধরতেই দ্বিতীয় পোকাটি তৎক্ষণাৎ তার মুখে বিদঘুটে তরল নির্গত করল। ওয়াক! থু! বলেই মুখ থেকে পোকাটি ফেলে দিলেন চার্লস্। হারালেন ডান হাতের পোকাটিকে ও। শেষে একটি পোকা নিয়েই বাড়ি ফিরলেন। ঐ সময় ইংল্যান্ডে বেশির ভাগ স্কুলই ছিল আবাসিক অর্থাৎ স্কুলের মধ্যেই বাচ্চাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। চার্লস্কে ও নয় বছর বয়সে তার বাবা বাড়ীর কাছের শ্রুজবেরি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু স্কুল ভারী অপছন্দ ছিল বালক চার্লসের। প্রথমত, ডরমিটরিতে থাকা তার কাছে ছিল খুবই জঘন্য একটা ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, চার্লসের মুখস্থ শক্তি ছিল খুবই দূর্বল। একটা কবিতা পড়লে দুদিন পরই তা ভুলে যেতেন। বাড়ির জন্য সর্বদা তার মন ছটফট করত। যেহেতু স্কুল

সাত বছর বয়সে ডারউউন

বাড়ি থেকে বেশি দূরে ছিল না, প্রায়দিন সন্ধ্যা-রাতে পরিবারের সদস্য ও প্রিয় কুকুর 'স্পার্ক'কে দেখার জন্য স্কুল থেকে লুকিয়ে বাড়িতে ঢু মেরে আসতেন। তবে খেয়াল রাখতে হত যাতে রাতে স্কুলের ফটক বন্ধ হওয়ার আগেই চলে আসা যায়। বড় ভাই এরাসমাসের সাথে চার্লসের খুব সখ্যতা ছিল। বাড়িতে দু ভাই মিলে বাগানে তৈরী

করেছিলেন নিজস্ব কেমিস্ট্রি ল্যাব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি চার্লসের কৌতুহলের কারণে বন্ধু-বান্ধবেরা চার্লসের নাম দিয়েছিল 'গ্যাস।' মজার ব্যাপার, চার্লসের শিক্ষক যখন এই ল্যাবের কথা জানতে পারেন তখন খুশী হওয়া তো দূরের কথা, শিক্ষক মহাশয় চার্লসকে ভৎসনা করেছিলেন এই বলে যে, চার্লস 'শুধু শুধুই সময়ের অপব্যবহার করছে।' চার্লসের পরীক্ষাগুলো শিক্ষকের ভাষায় ছিল 'ফালতু ব্যাপার।' আজ আমরা জানি, বালক চার্লস্ ডারউইন সম্পর্কে সেদিনকার সেই শিক্ষকের ভবিষ্যতবাণী কতটাই না ভুল ছিল! অবশ্য দুষ্টমিতে চার্লস্ মোটে ও অপটু ছিলেন না। একবার এক বন্ধুকে বোকা বানিয়ে ছিলেন এই বলে যে, বিভিন্ন রং-এর মিশ্রনে তৈরী রঙীন পানি গাছের গোড়ায় ঢেলে তিনি একই গাছে বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটানোর ক্ষমতা রাখেন। আরেকবার বাবার ফলের গাছ থেকে অনেকগুলি ফল পেড়ে ঝোপের মধ্যে সেগুলি লুকিয়ে রেখে নিজেই বাড়িময় প্রচার করেছিলেন, তিনি এক গুচ্ছ চুরি হওয়া ফলের সন্ধান পেয়েছেন।

চার্লসের পিতা রবার্ট ডারউইনের খুব ইচ্ছা ছিল, তাঁর দুই ছেলে চার্লস্ ও এরাসমাস তাঁর মত ডাক্তার হবে। সে অনুযায়ী তিনি প্রথমে বড় ছেলে এরাসমাস এবং পরে চার্লসকে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়াশুনার জন্য পাঠান। চার্লস তখন কিশোর, বয়ষ ষোল। মাত্র দুটি অপারেশন নিজ চোখে অবলোকন করেই বুঝতে পারেন, ডাক্তারী শাস্ত্র তার জন্য নয়। কিন্তু বাবার মন রক্ষার্থে মুখ ফুটে কিছু বলতে ও পারছেন না। নিরূপায় হয়ে ক্লাস এটেন্ড করে যেতে লাগলেন। যে সময়ের কথা বলা (১৮২০-এর মাঝামাঝি) হচ্ছে, তখন ও সার্জারী বা অপারেশনে ব্যথানাশক ওষুধ বা এনেস্থেসিয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। ফলে সার্জারীর রোগীদের প্রচন্ড কষ্টের মুখোমুখি হতে হত। যা হোক, এমনি করে অনিচ্ছা সত্ত্বে ও দু'বছর মেডিকেল শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর চার্লস্ শেষে একদিন সাহস সঞ্চয় করলেন। পিতাকে জানালেন, মেডিক্যাল সাইনস্ তাঁর পছন্দ নয়। রবার্ট ডারউইন তাতে প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হন। চার্লসকে তিনি এই বলে তিরষ্কার করেন, 'পাখি শিকার, কুকুর আর ইঁদুর ধরা ছাড়া তোমার মাথায় আর কিছুই ঢুকে না। তুমি তোমার নিজের এবং পরিবারের জন্য একটা কলংক হবে।' শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল চার্লসকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হবে যাতে সেখানে পড়াশুনা করে তিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের মিনিস্টার হতে পারেন। বলাবাহুল্য, মিনিস্টারের পেশাকে ও সে সময় লোকে বেশ সম্মানের চোখে দেখত। আর যেহেতু অনেক মিনিস্টারই সে সময় প্রকৃতিবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন, চার্লসের কাছে ও ব্যাপারটা একেবারে খারাপ মনে হয়নি। চার্লস্ কেমব্রিজে ভর্তি হয়ে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন।

১৮৩১ সালের গ্রীষ্মে বাইশ বছর বয়সে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে চার্লস্ ডারউইন বাড়ী ফিরেন। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন চার্চের মিনিস্টার হওয়ার জন্য। সে সময় কেমব্রিজ থেকে চার্লসের নামে একটি চিঠি আসে। পত্রের প্রেরক কেমব্রিজে চার্লসের বন্ধু উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন স্টিভেন হেনস্লো। জন চার্লসের বরাবরে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করেন। *চার্লস কি পৃথিবী ভ্রমণে ইচ্ছুক?* ব্রিটিশ নেভীর ক্যাপটেন রবার্ট ফ্রিজ্রয় এইচ এম এস বিগ্ল নামক জাহাজ নিয়ে কম পক্ষে বছর দুয়েকের জন্য পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছেন। ভ্রমণের একটা বাণিজ্যিক কারণ ও ছিল। গ্রেট ব্রিটেন তখন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ সমূহের সাথে আর ও বেশি করে ব্যবসা করতে আগ্রহী। ক্যাপ্টেন ও তাঁর ক্রুর দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষিন আমেরিকার আশপাশের সাগর অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করা যাতে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক জাহাজগুলি সহজে সেখানে যাতায়াতের পথ খুঁজে পায়। ক্যাপটেন রবার্ট ফ্রিজরয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিদ্যার প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা। তিনি চাচ্ছিলেন সমুদ্র যাত্রায় একজন প্রকৃতিবিদকে ও সংগে করে নিয়ে যেতে, যিনি নিজ খরছে যাবেন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণির নমুনা সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন। প্রকৃতিবিদ্যার প্রতি চার্লসের অপরিসীম ভালবাসার কথা জন হেনস্লো ভালভাবেই অবগত ছিলেন। আর সে জন্যই এই চিঠির অবতারনা। খবর নিয়ে পিতার কাছে ছুটতেই সেখানে চার্লস্ মুখোমুখি হলেন এক গাদা প্রশ্নেরঃ *চার্চের মিনিস্টার হওয়া তাহলে কি আর হবেনা? এভাবে জীবন আর কত দিন চলবে? তা ছাড়া সমুদ্র জীবন বিপজ্জনক ও বটে!* পিতা রবার্ট ডারউইনের কাছে পুরো ব্যাপারটি 'উদ্ভট পরিকল্পনা' বলে মনে হল। বেচারা চার্লস ভগ্ন মনোরথে চাচা (পরবর্তীতে শশুর) জসিয়া ওয়েজউডের দ্বারস্থ হলেন পিতাকে রাজী করানোর ব্যাপারে এবং শেষ পর্যন্ত অনুমতি আদায় হল!নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে ও পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৮৩১ সালের অক্টোবরে চার্লস ইংল্যান্ডের প্লেমাউথে পৌঁছালেন। সেখানে অবশ্য বিগ্ল জাহাজের মেরামতের কাজ এবং খারাপ আবহাওয়ার দরুন যাত্রা আর ও কয়েকদিন পিছিয়ে যায়। অবশেষে ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এইচ এম এস বিগ্ল শুরু করে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা। এর পরের ঘটনাগুলি ইতিহাস এবং অনেকেরই জানা। এখানে খেয়াল করার মত একটি বিষয় হচ্ছে- তখন ও চার্লস্ ডারউইন একজন ধর্মানুরাগী খ্রিস্টান ছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ খ্রিস্টানদের মত বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তিনি ও সে সময় বিশ্বাস করতেন, *ঈশ্বর সর্বমোট ছ'দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।* এমনকি জাহাজে অন্যান্য জিনিসের সাথে তিনি বহন করেছিলেন একখানা বাইবেল।

বিগ্‌ল জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার সুবাদে চার্লস্ ডারউইন জীবনে প্রথম বারের মত প্রত্যক্ষ করেন পাহাড় ও অন্যান্য ভূ-তাত্ত্বিক বস্তুর গায়ে বিবর্তনগত পরিবর্তনের চিহ্ন। বিখ্যাত গেলাপাগস দ্বীপপুঞ্জ (ডারউইন ছিলেন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী যিনি সেই দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করেন) থেকে সংগ্রহ করেন হরেক রকমের জীবাশ্ম(fossil), ছোট-বড় উদ্ভিদ ও প্রাণির নমুনা। তাঁর সংগৃহীত অনেক জীবাশ্মই ছিল অবলুপ্ত প্রাণিসমুহের এবং ডারউইন জানতে প্রচন্ড আগ্রহী ছিলেন কি কারণে ঐ সব প্রাণি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন প্রাণিকূলের মধ্যে বিরাজমান অংগসংস্থান ও অন্তর্গত তন্ত্রসমুহের পার্থক্য। বিশাল আকারে আর ও সংগ্রহ করেছিলেন হরেক প্রজাতির ফিংগে পাখি। এ সময় ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের দেয়া চার্লস লিয়েল নামক জনৈক ভূ-তত্ত্ববিদের লেখা 'প্রিন্সিপলস্ অব জিওলজি' বইটি বিশেষভাবে তাঁর অধ্যয়নে কাজে লাগে। এইচ এম এস বিগ্‌ল ইউরোপে ফিরে আসে ১৮৩৬ সালের অক্টোবরে। তবে বিগ্‌ল তখন যে ডারউইনকে ইংল্যান্ডে ফেরত নিয়ে আসে তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ- যাঁর চিন্তার জগৎ উলট পালট করে দিয়েছে বিগলের যাত্রা ও অভিজ্ঞতা। দেশে এসে বছরের পর বছর সংগ্রীহিত নমুনা নিয়ে একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়ে যান ডারউইন। সে সময় তিনি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে শিকারী প্রাণি, দূর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভূমিকা সম্পর্কিত তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। ভিতরে ভিতরে অধ্যয়ন ও গবেষণা পুরোদমে চালিয়ে গেলে ও বহু বছর চার্লস ডারউইন তাঁর থিওরীর কথা কাউকে জানাননি কেননা, আগেই বলা হয়েছে সে সময় মহাবিশ্ব ও প্রাণিকূলের সৃষ্টি সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের ধারণাই বাইবেলের 'ছয় দিন' তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই লোকজন খেপে যাওয়ার যথেষ্ট ভয় ছিল। এটা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না যে, জীবদ্দশায় ডারউইন হয়ত কোনদিনই তাঁর থিওরী প্রকাশ করার সাহস পেতেন না, যদি না শেষের দিকে তিনি জানতে পারতেন যে, সে সময় মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নামক আরেকজন তরুণ বিজ্ঞানী ও বিবর্তন সম্পর্কে হুবহু একই মতবাদ পোষণ করেন! আর তাই বহু বছর প্রতীক্ষা শেষে অবশেষে ১৮৫৯ সালে চার্লস্ ডারউইন প্রকাশ করেন তাঁর কিংবদন্তী ও ইতিহাস পালটে দেয়া বই **The Origin of Species by Means of Natural Selection** ডারউইন আগেই ধারণা করেছিলেন তাঁর পুস্তক বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটাবে এবং বাস্তবে হয়েছিল ও ঠিক তাই। সমস্ত ইংল্যান্ডে বইটি নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যায়, পক্ষে এবং বিপক্ষে। এই প্রথম বারের মত ডারউইনের কল্যাণে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল, ধর্মগ্রন্থই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেয়ার মালিক নয়। ডারউইন দেখালেন,আমাদের নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে এতদিন আমরা যা জেনে এসেছি, তা-ই চরম সত্য নয়। ঈশ্বর নামে কেউ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি এবং উদ্ভিদকূলকে হঠাৎ করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাননি। বরং মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির। আপাত বিচারে তাই ভিন্ন হলে ও আসলে সকল প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণিসমুহের উৎপত্তি হয়েছে একই প্রকার সরল কোষ থেকে। অত্যন্ত ধীরগতির প্রাকৃতিক নির্বাচন নির্ভর এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় লেগেছে বহু বহু মিলিয়ন বছর। বিবর্তন প্রক্রিয়া তাই বলে মানুষে এসেই থেমে যায়নি। বিবর্তন প্রতিনিয়ত চলছে, চলবে। এটি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য।

শিশু মাত্রই কৌতুহলী। ডারউইনই ও প্রথম অবস্থায় ছিলেন তেমনি একটি শিশু। কিন্তু লক্ষ করার মত বিষয়, অন্য সবার মত তাঁর সেই কৌতুহল প্রবণতা বয়সের সাথে সাথে হারিয়ে যায়নি। বিচার-বিশ্লেষণ-যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অজানাকে জানার কৌতুহল সৃজনশীল ও চিন্তাশীল মানুষদের মাঝে থেকে যায় সারা জীবন। সে রকম আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করে লেখা শেষ করছি। ১৮৫৯ সালের মে মাসে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর পুস্তক লেখা শেষে ডারউইন তখন দারুণ ক্লান্ত। ম্যুর পার্ক নামক এক স্থানে তিনি তখন ছুটি কাটাচ্ছেন। একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ডারউইন লক্ষ করলেন, একদল লাল পিঁপড়ে এক বাসা থেকে আরেক বাসায় ককূন (cocoon) বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখা গেল এ সময় কয়েকটি পিঁপড়ে আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলছে। ডারউইনের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, *এর কারণ কি হতে পারে?* তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কেবল একটা পিঁপড়েকে প্রথম থেকে শেষ অবধি পর্যবেক্ষন করে দেখবেন এটির বেলায় কি ঘটে। হঠাৎ করে সেখানে এক ভবঘুরে এসে উপস্থিত হল। এক শিলিং-এর বিনিময়ে লোকটিকে ও ডারউইন তাঁর পিঁপড়ে গুনার কাজের সংগী করলেন। এমন সময় সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ী উপস্থিত হল। যাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে দেখলেন, রাস্তায় উবু হয়ে দু'জন লোক পিঁপড়ে গুনছে! ডারউইনকে তখন ও লোকজন চিনত না। ঘোড়ার গাড়ীর যাত্রীরা তাই বিস্মিত হয়েছিল এই ভেবে যে, চেহারা ও পোশাকআশাকে দেখতে ভদ্রলোকের মত একজন ব্যক্তি কেন ধূলাবালি মাখা রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বাচ্চাদের মত পিঁপড়ে গুনছে! তাঁরা নিশ্চয় সেদিন জানত না, তাঁদের সামনের সেই লোকটির নাম খুব শীঘ্রই ইংল্যান্ড ছাড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে যাবে। তবে একটি ব্যাপার তাঁরা ঠিকই ধরেছিল, ডারউইনের শিশু সুলভ আগ্রহের ব্যাপারটি। এই একটি ব্যাপারে প্রতিটি বড় বিজ্ঞানীর সাথে বাচ্চাদের রয়েছে বিশাল মিল। আমাদের তাই খেয়াল রাখতে হবে, শিশুদের কৌতুহল ও অজানাকে জানার আগ্রহকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে আমরা যেন এর লালন ও বিকাশে মনোযোগী হই। তাহলেই সমাজে আর ও অধিকহারে দেখা দিবে ডারউইন, আইনস্টাইন এবং তাঁদের মত বরণীয়রা।

সবাইকে ডারউইন দিবসের ভালবাসা।

নিউ ইয়র্ক
ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০৭

লেখকের পরিচয়ঃ মুক্তমনা হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর। বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স। ই-মেইলঃ **worldcitizen73@yahoo.com** ওয়েব সাইটঃ **www.mukto-mona.com**

তথ্য সূত্রঃ
*Charles Darwin, *Autobiography*, 1876
* Deborah Hopkinson, *Who Was Charles Darwin?* Grosset & Dunlap, New York, 2005.
ছবিঃ http://gatornet.chapin.edu/~ispaceRLB09/